‘লালসালু’ — ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ

*ডঃ প্রভাকর মণ্ডল

জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উপন্যাস। উপন্যাস যেমন সর্বগ্রাসী, ঔপন্যাসিকও তেমনি সর্বত্রচারী যিনি তাঁর নির্ভীক, নিরাসক্ত ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ প্রতিম লেখক, চল্লিশের দশকের প্রতিভাস সম্পন্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৫ আগস্ট, ১৯২২ খ্রী- ১০ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রী)। নিজেকে বিবিক্ত ও নিঃসঙ্গ বলে উল্লেখ করলেও তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’তে (১৯৪৮খ্রী) নিঃসঙ্গতা ও বিবিক্ততার কোনও চিহ্ন নেই। বরং এই উপন্যাসে তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ অতি প্রখর। তথাকথিত মুসলমান সমাজের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতার পাশাপাশি পশ্চাদপদ গ্রাম সমাজের ধর্মীয় সংস্কার আক্রমণের লক্ষ্য।

‘লালসালু’ উপন্যাসের ঘটনায় কোনও জটিলতা নেই, জটিলতা আছে চরিত্রে। অশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ংকরভাবে ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় আচারভীরু মানুষদের নিয়ে। ধর্মাচার এদের নানাভাবে শোষণ করে, অন্ধ করে রাখে — এই শোষণকে সরাসরি আঘাত করেছে। মজিদ এই শোষণের অন্যতম প্রতিনিধি। ভিনদেশ থেকে ক্ষুধার তাড়নায় আগত শীর্ণকায়, তীক্ষ্ণকণ্ঠ, কোটরাগত চক্ষু খরদৃষ্টির মানুষ, মহব্বত নগর গ্রামের কেউ যাকে চেনে না সেই মজিদের আগমন গোটা গ্রামকে চমকে দেয়। ঝোপঝাড়ের মধ্যে অবহেলিত একটা কবর দেখেই মজিদের মগজে চকিতে বুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটে যায়, চমকে দেয় তার তীক্ষ্ণকণ্ঠ চিৎকার ও গালিগালাজ দিয়ে, ‘আপনারা জাহেল, বে এলেম, অনপড়হ্। মোদাচ্ছেব পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেস?’ (‘লালসালু’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১৬)। ধর্মাচার ও অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস দিয়েই এই কাহিনি-ধর্মাচারের পথে মজিদের উত্তরোত্তর শক্তি, প্রভাব ও শ্রীবৃদ্ধির আকাশে কাহিনির শেষভাগে একটা ছোটো মেঘ দেখা দিয়েছে। একটি যুবক নাম তার আক্কাস, সে গ্রামে একটা স্কুল খুলতে চায়। দ্বিতীয় মেঘ মজিদের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিদ্রোহিনী জমিলা। সেইসেঙ্গা বিস্ময়ের কথা তার প্রথমা স্ত্রী ঠাণ্ডামানুষ পতিভক্তি-পরায়ণা পরম অনুগতা রহিমা। মজিদের পরাজয়ের সূচনার ইঙ্গিত এখানেই। বাংলার মুসলমান সমাজ অশিক্ষিত, অনুন্নত, দরিদ্র এবং শোষিত। পীরগিরি, অশিক্ষা, ধর্মীয় সংস্কার সব একসঙ্গে গাঁথা। উপন্যাসে শোষণই একমাত্র শেষকথা নয়, সমাজের মধ্যে থেকেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। লালসালু উপন্যাসে দুটি প্রতিরোধ শক্তির ইঙ্গিত পাই। প্রথমত অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস, ধর্মীয় অনুশাসনের ধারক-বাহকেরা যার ঘোর বিরোধী। আর অন্য প্রতিরোধী শক্তি হল মানুষ নিজে : মানুষের মধ্যে তার নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত স্বাধীনতার

আকাঙক্ষার জাগরণ, সাহসের জাগরণ, বলতে পারি বিবেকের জাগরণ। উপন্যাসের মূল চরিত্র মজিদ যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে সীমাহীন দারিদ্র তাদের নিত্য সঙ্গী। এখানে 'শস্যের চেয়ে টুপির সংখ্যা বেশি।' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১০)। ফসলের জমি থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা খুবই কম। আবার অতি বৃষ্টিতে, খরায় জমির ফসল নষ্ট হয়, নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয় চাষের আবাদযোগ্য জমি। তাই তারা ক্ষুধা, অনাহার আর দারিদ্রের নিত্য শিকার। এই অবস্থায় অধিবাসীদের বেরিয়ে পড়ার একটা তাগিদ প্রতিনিয়ত তাদের তাড়া করে ফেরে। লেখকের বর্ণনা — 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনোখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে — প্রদেশেরও; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হাঁ-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন-মান-ক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল।' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৯)।

না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের জন্য জন্ম নেয় অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। ধর্মের খোলসের মধ্যে তাদের বিচরণ। কিন্তু খোদার এলেমে বুক ভরে না, তলায় পেট শূন্য বলে। 'আর কেতাবের অক্ষরগুলি' কোন বিগত যেগের চড়ায় পড়ে আটকে থাকে। এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। দূরে-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এরা নানা পেশায় নিযুক্ত হয়। অনেকে বেরিয়ে পড়ে আরও দূরে 'বাহে মুলুকে নয়ত মনিরের দেশে।' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১২)। সমাজ ব্যবস্থার অসম বিকাশের ফলে নিমজ্জিত সত্তা। তবু নিঃশেষিত হওয়ার ইচ্ছা মজিদের নেই। সে উপস্থিত হয়েছে গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ বানিয়েছিল সেখানেও। কিন্তু সেখানেও আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা মজিদ অর্জন করতে পারেনি।

মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করার পটভূমি এই রকম: 'একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়া শূন্য স্তব্ধতায় মাঠ প্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে। এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙিতে দু'জন করে, সঙ্গে কোঁচজুতি। নিঃশব্দ ধানক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। মজিদের মনে ভয়, দোদুল্যমানতায় সে বিচলিত। শুধুমাত্র ভালভাবে বেঁচে থাকার

প্রয়োজনে সে যে খেলা শুরু করতে যাচ্ছে তার ফলাফল ভাল নাও হতে পারে। তবু ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। বাধা যতই পর্বতপ্রমাণ হোক তাকে অতিক্রম করতে হবে। অসহায়ের মত মার খেতে সে রাজি নয়।

মজিদ ভাবে, নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের পর জীবন আরও কতভাবে ভোগ করা যায় এই ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে। সে অনুভব করে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবনকে উপভোগ করতে না পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আরাম-আয়েষ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা? রহিমা তার কামনাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তার রক্তে নেশা জাগান উত্তাপ ছিল না। এই অতৃপ্তির পথ ধরেই মজিদের মনে নানা হীন প্রবৃত্তি জেগে উঠতে থাকে। মজিদ মহব্বতনগরে প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও উত্থানের পথে এতদিন সে বড় ধরনের কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি। নিখুঁত ছিল তার রণকৌশল। আর ছোটখাট বাধা বা প্রতিবাদের সামনে সে বুদ্ধি ও কৌশলে তা পরাভূত করেছে। তাহের-কাদেরের বাপ, প্রতিবাদী যুবক আক্কাশ, আমেনা বিবি ও আওয়ালপারে নবাগত পীর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মজিদের মুখে অসহায় বিষণ্ণতার সুর শোনা যায়। সে প্রায় আত্মসমর্পণের মত জমিয়াকে উপদেশ দিয়ে খোদার ভীতি সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মজিদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। জমিলার প্রতিবাদী মানসিকতার সামনে মজিদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়তে থাকে। তবু জমিলাকে বশে আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলতে থাকে। মজিদ জমিয়াকে দড়ি দিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধে। মজিদের নিষ্ঠুরতা বাড়তে থাকে। কিন্তু জমিলা নির্বিকার।

মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা ভয় পেয়ে কাঁদবে। কিন্তু জমিলা কাঁদলও না, ভয় পেয়ে সাহায্য ভিক্ষাও চাইল না। মজিদ বলে, 'তুমি চুপ কিরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১৩০)। এই উপদেশ দিয়ে মজিদ চলে গেল। কিন্তু নির্বিকার জমিলার কোন ভাবান্তর নেই।

'লালসালু' উপন্যাসে ভাগ্য বিড়ম্বিত মজিদের যশ, প্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনি অতি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন ওয়ালীউল্লাহ। গ্রামের দরিদ্র লাঞ্ছিত কৃষিজীবি সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান, সমাজের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হন মজিদের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা। ধর্ম-মানুষকে ভয় দেখানোর, দমন করার, শোষণ করার, নিষ্ক্রিয় করার, কর্তৃত্ব করার এমনকি আধিপত্য স্থাপন করার প্রধান অস্ত্র। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা মানবিক রেনেসাঁর অন্তরালে সবসময় জিইয়ে রেখেছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পুঁজিতন্ত্রী সংস্কৃতি। এই পাঁজিতন্ত্রী সংস্কৃতি সবসময় মদত দিয়েছে, পুষ্ট করেছে ও প্রসারিত করতে চেয়েছে

ধর্মকেই। কারণ ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বুঝতে পেরেছিল সমাজীকৃত মানবজাতির মুক্তবোধ এবং চেতনা দখল করতে না পারলে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের কায়েমি ব্যবস্থাতন্ত্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর টিকিয়ে রাখতে না পারলে অধিক সংখ্যক জনমানুষের উপর মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান শ্রেণি তাদের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব বজায় রাখবে কী প্রকারে? সুতরাং মানুষকে এমন এক সাধারণ সংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক টাইপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যার দ্বারা তাদের দিয়ে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের দালালি ও দাসত্ব দুই করিয়ে নেওয়া সম্ভব। ধর্ম বাইরের দিক থেকে হয়ে রইল নৈতিক খোলস, ভেতরের দিক থেকে থাকল পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থপ্রহরী।

লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- 'I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে — আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সে-দিক পানে। ...মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই ; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা, এই-অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই।... ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১৩০)। আপন মতাদর্শে অবিচলিত ছিলেন এই মহান্ কথাশিল্পী। রচনারীতিতে ও বিষয়বস্তুতে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র জীবনের বড় অংশ বিদেশে কাটলেও তাঁর উপন্যাসের পটভূমি স্বদেশ। পরিবেশ, চরিত্র, সমস্যা, সংকট ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি গ্রহণ ও চিত্রণ করেছেন একান্তভাবে স্বদেশকে। জমিলা মজিদের কাছে মাথা নত করে না। ব্যর্থ, রুষ্ট মজিদ, মাজারে একটি খুঁটির সঙ্গে কোমর বেঁধে তাকে বন্দিনী করে। জমিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখে, '...লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে শুয়ে আছে জমিলা... আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ে লেগে আছে।' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১৩৫)। জমিলা প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকট হয় — বাঙালি মুসলিম সমাজের ও জীবনের অন্তর্লীন সংকট, মজিদদের অস্তিত্বে, কখনোই এড়ানো যায় না।

এই উপন্যাসের লেখক সাংকেতিক এবং প্রতীকের ব্যবহার অতি নিপূন ভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে তার কিছু উল্লেখ তুলে ধরলাম। "ঘরে কিছু নেই" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৯) — এটি হতভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। "ঝনঝন করে ওঠে লোহা লক্কর" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৯) — প্রতিবাদের ভাষা। "অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা নেই" — এমানে মানবজীবনের জন্মমৃত্যুর দীর্ঘতা। "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি" — ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১০) ধর্মের সংস্কার মজ্জাগত। "__ প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন" — ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ২৭) মজিদের প্রতাপ ধর্মকে নিয়ে। যুগে যুগে কালে কালে নারী যে সর্বংসহা তা মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহিমা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে — "ও পাড়ার ছুনুরবাপ মরণ রোগে যন্ত্রনা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও।

খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে — তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপর করুণা করো, রহমৎ করো। চারগ্রাম পরে বড়ো নদী। কদিন আগে সে নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে যারা গেছে কটি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা তাদের ওপর যেন তোমার রহমৎ হয়।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ২৮)। "মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু, সে রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে।" — ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৩৭) মজিদের অন্তরে এক ভয় কাজ করছে। "বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে" — ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৫৫) সমষ্টির উন্নয়নের জন্য এককের স্বার্থকে ক্ষীন করা হয়েছে। "জীবন স্রোতে মজিদ ও খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমিজোতের প্রতিপত্তি। স্বজ্ঞানে না জাননেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৬৫)। মজিদ এবং খালেক ব্যাপারী চোরে চোরে খাসতুতো ভাই, পথ তাদের এক শোষন করা। খালেকের বন্ধ্যা স্ত্রী আমেনার প্রতি ধর্মীয় আচার পালনের পর মজিদ ঘোষনা করে আমেনা অসতী। তাকে ধর্মীয় বিধান দেয় তালাক দেওয়ার। আমেনাকে চলে যেতে হয় সংসার ছেড়ে। "কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কি ক্ষমা নেই?" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৯১) — এই উক্তির মধ্য দিয়ে রহিমার মনে নারীচেতনাবাদের জন্ম নেয়। "মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস গ্রামে স্কুল বসানোর প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়।" ফালগুনের পাগলা হাওয়া যেন সৃষ্টির প্রতীক হয়ে কিংবা প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। মজিদের মন — "ধুলা ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলির কথা।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ৯৮) মজিদের দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলা প্রতিবাদের ভাষা পায় তার মুখে। মজিদকে ভাবে — "তানি বুঝি দুলার বাপ" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১০৫) এবং সতীন রহিমাকে দেখে ভাবে — "তুমি বুঝি শাশুড়ি।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১০৫)। "তুমি কি বদদোয়া দিছিলানি" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১২০) — এটি শুধু মজিদের উচ্চারনই নয় স্বার্থান্বেষী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভু। "মোমবাতি ক্ষয়ে আসা — কেবল ক্ষয়ে আসা মোমবাতি দুটো তখনও নিষ্কম্প স্মিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১১৭) এবং "বাইরের থেকে আকাশে যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজা টিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌছায় না।" ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১২৮) — জমিলার প্রতিবাদ এত ক্ষীন যে সে প্রতিবাদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোন সারা দেয় না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত ভণ্ডামি উন্মোচন করেছেন লালসালু উপন্যাসে। তিনি সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার বক্রবাস্তবতার স্বরূপ বুঝেছিলেন নিজের সময় তরঙ্গের অভিমুখে দাঁড়িয়ে। এই উপন্যাস আসলে ঔপনিবেশিক পুঁজিতন্ত্রের চাপ থেকে লেখা, মর্মবেদনা থেকে লেখা, আলো-আঁধারের আত্মসমালোচনা থেকে লেখা। ততদিনে ধর্মীয় উন্মাদনাকে সামনে রেখে রেডিমেড দেশভাগের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই উপন্যাসের মজিদ সে শুধু ধর্মকে নিজক পুঁজিতন্ত্রে আত্মসাৎ করার ঔপনিবেশিক মৌলবাদের প্রতিভূ। ধর্মের শাসন তীক্ষ্ণ ও আগ্রাসী কের তুলতে পারলে মানুষ নিঃশর্ত তর্কহীন আত্মসমর্পণকারীতে দ্রুত পরিণত হয়ে যায়। ইসলামি বহির্জীবনের ও অন্দরজীবনের এই তর্কহীন দুর্বলতাকে অশেষে ব্যবহার করে নিতে নিতে মজিদ দেখাল এভাবেই পৌঁছানো যায় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অন্দরজীবনের ঔপনিবেশিক চরিতার্থতায়। লক্ষ্যহীন, দিগভ্রান্ত, অনুন্নত দেশের অন্তেবাসীরা মজিদ প্রবর্তিত ধর্মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হতেই আমরা বুঝে যাই বিশ্ব পুজিঁবাদও তো এভাবেই দেশে দেশে ঔপনিবেশিক চেতনা দখলে সমর্থ হয়েছিল। মহব্বত নগরের গরিব অশিক্ষিত বোকা এক নির্বোধ মানুষজনকে মজিদ ধর্মের নামে সর্বব্যাপ্ত নেতিবাচকতার দ্বারা আচ্ছন্ন করে নিতেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় — পৃথিবীর স্থূল হাতে ব্যবহৃত হতে হতে ধর্মও ক্রমশ এক অবক্ষয়বাদ — এই চূড়ান্ত সত্যটি। মজিদের ছদ্মবেশে গ্রামীণ নিম্নবর্গের সমাজ সংস্কৃতিকে ঢুকে পড়েছে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন। তবু বলতে পারি অন্য মাটিতে, অন্য জমিতে, অন্য স্বদেশে, শিকড় গাড়লেও সুচতুর উপনিবেশবাদ মজিদের মতোই বন্ধ্যা। সৃষ্টির রস ও রসদ কোনটাই পাওয়া যাবে না ওই ত্বের সঙ্গা-সংক্রমণে। মজিদের মহব্বত নগরে প্রবেশ তৃতীয় বিশ্বে উপনিবেশবাদের প্রবেশ ঘটল, সেই সঙ্গা প্রবেশ করল সাংঘাতিক ভয়বোধ। ইসলামি বঙ্গাসমাজের নিগূঢ় প্রচ্ছদে তৃতীয় বিশ্বের ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্তর্কথন। বহিরাগত হয়েও মজিদ আধিপত্যবাদের চূড়ান্তে পৌঁছে যেতে পেরেছে। অঢেল সম্পত্তির মালিক খালেক ব্যাপরির মনেও সুপ্ত ও অজানিত ভয়বোধ বারবার উস্কে তুলে মজিদ ভোগ ও মৌলবাদের ঔপনিবেশিক অবদমন ক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। মাজারের অজানিত রহস্যময়তা থেকে একটায় পর একটা ভয়বোধ তুলে এনে মজিদ তাদের ছড়িয়ে দিয়েছে ঘরে, মাঠে, মনে, অন্তঃপুরে। পীরের মাজারটিকে মজিদ আসলে ভয় দেখাবার মনস্তাত্ত্বিক মুখোশ হিসাবেই ব্যবহার করেছে। ফলে 'লালুসালু' উপন্যাসে মাথাহেঁট একটি অশিক্ষিত সমাজের অব্যক্ত লোকায়ত ছন্দ তলে তলে এককেন্দ্রিক প্রথা ব্যবস্থায় গুমরে উঠেছে। মজিদ তো এমনটাই চেয়েছিল। লৌকিকে যত কান্না উঠেছে, যত ভয় উঠেছে — মজিদ ততই হয়ে উঠেছে মৌলবাদের ক্ষমতাসম্পন্ন টেক্সট। নব্যশিক্ষিত আক্কাস — যে বোঝে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তার উদ্দেশ্য স্কুল স্থাপন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁদা আদায়ের সঙ্গে জোরাল আবেদনপত্র সরাসরি সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। আক্কাসের এই প্রবণতায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে মজিদ। কারণ শিক্ষার

প্রসার ঘটলে গ্রামীণ ইসলাম সংস্কৃতি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবার নির্ভরযোগ্য অবলম্বন পেয়ে যাবে। মজিদের তত্ত্বাবধানে সভা বসিয়ে সেই প্রচেষ্টাকে নিঃস্ব করে দেবে।

'ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো' — বললেও কে কীভাবে আঘাত হানবে? শুধু মহব্বত নগর বলে নয়, সমগ্র বিশ্বপটভূমিতেই আক্কাসেরা চিরকাল একা অস্ত্রহীন। তাদের উত্থান অপেক্ষা প্রস্থানকার্যই অতি দ্রুত সমাধা হয়। যদিও মজিদের পাওয়ার পলিটিক্স(Power Politics)যে চূড়ান্তে পৌঁছেছিল সেই প্রথম ফাটল প্রতিভূ হয়ে দেখা দেয়। ভোগ ও মৌলবাদ নারী জীবনের উপরই তো বারবার এমন হিংস্র আনন্দের শোষণ প্রতিষ্ঠা করে। জমিয়াও সেই ভোগ ও মৌলবাদের বাইরে নয়। মজিদের দুর্ভাগ্য হাসুনির মা কিংবা আমেনা বিবি কিংবা রহিমাকে যেভাবে সেক্সুয়াল পাওয়ার দ্বারা ব্যবহার করা যায় — জমিলার ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হয় না। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মজিদরা চিরকাল রহিমার মতো নারীদের-ই পেতে চায় যারা নির্বিবাদে কর্তৃত্বের ফাঁস মেনে নেয় এবং নিরুপায় নারী জীবনে ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জমিলা যখন রহিমার মতো সবকিছু নির্বিবাদে মেনে নিল না, জমিলা যখন চপলতার ক্রীড়ায় তার নারীজীবনে অন্য এক মাত্রা যোগ করল কর্তৃত্ববাদী মজিদ তখনই ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হল।

জমিলা পুরুষ ও মৌলবাদ শাসিত সমাজে অধিকারহীন নারীর এক বেদনাবহ প্রতিনিধি। মজিদ লোভী, ধর্মব্যবসায়ীর ভোগের বেদিমূলে যার স্বপ্ন, আশা, আকাঙক্ষা সব ধূলিসাৎ হয়েছে। তাই জমিলার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার কাছে অর্থহীন হয়েছে ধর্মীয় উপদেশ, অশ্রদ্ধেয় হয়েছে মাজার। এই চরিত্রটি উপন্যাসের অল্প স্থান অধিকার করে থাকলেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সে মজিদের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। জমিলা নিঃশব্দ অথচ বিদ্রোহী প্রতিবাদী। জমিলা তার জীবনে এক মূর্তিমতি দুর্যোগ। সকালে মজিদ ফসলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে। একজন হাহাকার করে কেঁদে প্রশ্ন করে, 'সব তো গেল। এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কি?'—'নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কেল রাখো' ('লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্টা — ১৩৬) - বলে মজিদ হাঁটতে থাকে। চোখ যেন বিশ্বাসের পাথরে খোদাই করা তার।

পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবন ধর্মের চেয়ে কর্মের আয়োজন অনেক বড়ো। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মকে পুঁজি করে তাদের শাসন শোষণ অব্যাহত রাখে। যুক্তিহীন এক অন্ধকারময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাস্তব চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তাই 'লালসালু' ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কালজয়ী সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) বিষয় : বাংলা উপন্যাস, সম্পাদক — বীরেন চন্দ, বইওয়ালা, ১৪৯ ক্যানাল ষ্ট্রীট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮

২) গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে — হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াস, এন-৩০, ২৫/৩ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলকাতা-৩৭

৩) সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ-সাহিত্য, সম্পাদনা-হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৩৯

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- ড০ দেবেশ কুমার আচার্য্য , ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, টি ৩১/বি কলেজ রোড, কলকাতা -৩৯

৫) 'লালসালু', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, ১২ বঙ্কিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাহারকাটিয়া মহাবিদ্যালয়, নাহারকাটিয়া-৭৮৬৬১০, ডিব্রুগর, আসাম।